দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 01 JUN 1998
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

বুয়েটে'র শিক্ষক সমিতি এখন দারুণ বিপাকে

এম আর আখতার মুকুল

ফোঁটা বাঁশে লেজ আটকা পড়েছে'- এ ধরনের কোনো কথাই আমি বলবো না। বিষয়টা হচ্ছে এক শ্রেণীর শিক্ষকদের রাজনীতি এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-ধর্মঘটের প্রেক্ষিতে অচলাবস্থার সৃষ্টি। সিলেটের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের 'শিক্ষক রাজনীতি' সম্পর্কিত বক্তব্যের পূর্ব পর্যন্ত এ মর্মে ধারণা ছিলো যে, শুধুমাত্র এক শ্রেণীর ছাত্ররাই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নির্দেশ মোতাবেক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের অব্যবহিত পরেই বুয়েটের শিক্ষক সমিতির কর্মকাণ্ডে বিস্মিত হয়েছি। এখানে রাজনীতিবিদদের সঙ্গে শিক্ষক সমিতির যোগাযোগের আলামত পাওয়া গেছে। বিএনপি নেতৃবৃন্দের পরামর্শ মোতাবেক ধর্মঘট শিক্ষকদের সমর্থনে বুয়েটের ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের শোভাযাত্রা হয়েছে এবং বিএনপি নেতৃবৃন্দ বিবৃতিও দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হলো। বুঝতে পারলাম যে, বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে ছাত্ররা ছাড়া এক শ্রেণীর শিক্ষকরাও সীমিত আকারে হলেও রাজনীতিতে জড়িত হয়ে পড়েছেন।

আসলে বিষয়টা হচ্ছে পেশাগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। স্থাপত্য শাখা বনাম সিভিল, মেক্যানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল প্রভৃতি শাখার পুরাতন ঝগড়া। কিছুটা দুরূহ বিষয় বিধায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপত্য শাখার কোর্স হচ্ছে ৫ বছরের। কিন্তু অন্যান্য শাখার কোর্স ৪ বছরের। এ জন্য স্থাপত্য শাখায় ভর্তির পরীক্ষাও পৃথকভাবে হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হবার পর বিশেষতঃ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইমারত তৈরীর ক্ষেত্রে স্থাপত্যবিদদের অধীনে বিভিন্ন ধরনের প্রকৌশলীদের চাকুরী করতে হয়। বিভ্রাটটা এই জায়গায়। সম্প্রতি বুয়েটে এতো দিনকার এই 'চাপা আক্রোশের' বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এবং শিক্ষকরাও এই রাজনীতিতে দারুণভাবে জড়িয়ে পড়েছেন। ফলে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

এক্ষণে ঘটনা প্রবাহের প্রতি আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয় মনে হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে চলতি বছরে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে সংখ্যাধিক্যের জোরে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এখন থেকে স্থাপত্য শাখার ভর্তি পরীক্ষা আর পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হবে না; সমস্ত শাখার ভর্তি পরীক্ষা একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে। উপরন্তু স্থাপত্য শাখায় ভর্তির ক্ষেত্রে পদার্থ বিদ্যায় পরীক্ষা দিতে হবে। এই সিদ্ধান্ত থেকেই গোলযোগের সূত্রপাত। স্থাপত্য শাখার মর্যাদা হ্রাস করায় এই শাখার ছাত্ররা হলো প্রতিবাদমুখর। এই শাখায় শুরু হলো অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট। বিভাগীয় শিক্ষকরা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করলেন। আন্দোলনের এক পর্যায়ে স্থাপত্য শাখার শিক্ষকবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিষয়টা সম্পর্কে অবহিত করান। প্রকাশ, চ্যান্সেলার মহোদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার পরামর্শ দেন এবং পরবর্তী বছর থেকে অতীতের পৃথক ভর্তি পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনার আশ্বাস দেন। এদিকে আন্দোলনের এক পর্যায়ে চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে স্থাপত্য শাখার ১৩ জন শিক্ষক একযোগে পদত্যাগ করেন। সিনেট উল্লেখিত 'যৌথ পদত্যাগপত্র' গ্রহণ করে।

এদিকে চ্যান্সেলার হিসেবে শেখ হাসিনার সঙ্গে উপাচার্য ডঃ ইকবাল মাহমুদের বৈঠক হয়। প্রকাশ, এই বৈঠকে আলোচনাকালে শেখ হাসিনা এ মর্মে বলেন যে, এটা হচ্ছে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এর মধ্যে রাজনীতি টেনে আনা বাঞ্ছনীয় হবে না। দেশের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। অতএব এদের শিক্ষা বর্ষের প্রতি লক্ষ্য রেখে আলোচনার মাধ্যমে উভয় পক্ষ 'সমঝোতা'য় উপনীত হলে তিনি খুশীই হবেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শেখ হাসিনা যেমন স্বয়ং উদ্যোগ গ্রহণ করে 'নিরপেক্ষ' হিসেবে পরিচিত বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে রাষ্ট্রপতির পদে সমর্থন দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে তিনি একই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জিয়াউর রহমানের এককালীন কৃষি প্রতিমন্ত্রী ডঃ ইকবাল মাহমুদকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে নিয়োগদান করেছিলেন।

> এখন উদ্ধার পাওয়ার রাস্তা কোথায়? লং মার্চের আন্দোলন যেমন বিএনপি'র গলায় কাঁটার মতো আটকে রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে বুয়েটে আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী নিয়েও শিক্ষক সমিতি দারুণ বিপাকে পড়েছে। একদিকে "মান-সম্মান" বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় যেমন শিক্ষক ধর্মঘট প্রত্যাহার করা সম্ভব হচ্ছে না এবং অন্যদিকে তেমনিভাবে উপাচার্যের শূন্যপদে নিয়োগ লাভের জন্য জনাকয়েক সিনিয়র অধ্যাপক গোপনে 'লবি' শুরু করায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে বেশ নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হাসিনা-ইকবাল বৈঠক হৃদ্যতার মধ্যে সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও স্বার্থান্বেষী মহল থেকে দ্রুত এ মর্মে রটনা করা হলো যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চ্যান্সেলার হিসেবে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করেছেন। বিএনপির কট্টরপন্থীদের ধারণায় এই বিষয়টাকে সরকার-বিরোধী আন্দোলনের একটা 'ইস্যু' তৈরী করার সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। আর যায় কোথায়? এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধী পক্ষ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লো। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে শুরু হলো শিক্ষকদের (স্থাপত্য শাখা ছাড়া) ধর্মঘট। বিএনপি নেতৃবৃন্দ কড়া ভাষায় বিবৃতি দিলেন। আর প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল ধর্মঘটী শিক্ষকদের সমর্থনে শোভাযাত্রা বের করে সমগ্র বিষয়টা রাজনীতির সঙ্গে দারুণভাবে জড়িয়ে ফেললো। চীনা বামপন্থী কলামিষ্টরা তাঁদের লেখনীতে আরো ইন্ধন যোগালো। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। তাঁরা প্রশ্ন করলেন, তা'হলে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের আর কিছুই অবশিষ্ট রইলো না।

এদিকে চ্যান্সেলার শেখ হাসিনা ঘটনা আকস্মিকতায় স্তম্ভিত হলেন এবং কার্যতঃ 'নীরব' হয়ে গেলেন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় চ্যান্সেলার তথা সরকার বিরোধী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। ঠিক এমনি এক সময়ে আন্দোলনকে আরো চাঙ্গা করার লক্ষ্যে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭১ জন শিক্ষক তাঁদের অধ্যাপকের পদ বহাল রেখে কেবল অতিরিক্ত প্রশাসনিক পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। অর্থাৎ 'মাসকাবারী' অধ্যাপক হিসেবে বেতন-ভাতা তাঁরা ঠিকই গ্রহণ করবেন। শুধু অতিরিক্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকবেন। কিন্তু এমন চাতুর্যের সঙ্গে পদত্যাগ সংক্রান্ত প্রেস রিলিজ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো, যাতে দেশবাসীর মনে এ মর্মে ধারণা হলো যে, এরা অধ্যাপকের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। একেই বলে "দু' নম্বরী কর্মকাণ্ড" ('কারবার' শব্দ ব্যবহার করলাম না)।

এখানেই শেষ নয়। ডঃ ইকবাল মাহমুদ উপাচার্যের পদ থেকে পদত্যাগ করলেন এবং পদত্যাগপত্রে ডঃ মাহমুদ দস্তখত করার পর খামে তা সীলমোহর করা হলো। এরপর পিয়ন বুকে এন্ট্রি করে সেই পদত্যাগপত্র প্রধানমন্ত্রী সচিবালয়ে পাঠিয়ে দেয়া হলো। পরদিন ফলাও করে ৭১ জন শিক্ষক ও উপাচার্যের পদত্যাগের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো। এদিন হিসেব মতো বিএনপি নেতৃবৃন্দের ইশারায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রদলের সরকার-বিরোধী শোভাযাত্রা বের হলো। এতে মূল শ্লোগান ছিলো 'উপাচার্যের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে হবে।' শ্লোগানের মাধ্যমে এবং বক্তৃতায় এমন ধারণার সৃষ্টি করা হলো যে, চ্যান্সেলার শেখ হাসিনার মৌখিক নির্দেশেই এই পদত্যাগ হয়েছে। অতএব উপাচার্যের পদত্যাগপত্রের প্রত্যাহার চাই। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, তখনও পর্যন্ত প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদত্যাগপত্র প্রধানমন্ত্রী এবং পদাধিকার বলে বুয়েটের চ্যান্সেলার শেখ হাসিনার টেবিলে পর্যন্ত পৌঁছায়নি। তিনি শুধুমাত্র সংবাদপত্রের পাতায় এবং গোয়েন্দা রিপোর্টে 'বুয়েটে'র আন্দোলন সংক্রান্ত খবর দেখতে পেয়েছেন। আগেই বলেছি যে, ডঃ মাহমুদকে আলোচনার মাধ্যমে 'সমঝোতা' করার পরামর্শের বিষয়টাকে এভাবে অপব্যাখ্যা করে শিক্ষক সমিতি এরকম 'কড়া ধরনের রাজনীতি' করবেন, শেখ হাসিনা তা ঘূর্ণাক্ষরেও চিন্তা করেননি। চ্যান্সেলার পক্ষে এ ধরনের পরামর্শ যদি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ হয়, সেক্ষেত্রে কোনোরকম উচ্চবাচ্য না করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। অতএব অবস্থাদৃষ্টে একথা বলা যায় যে, প্রধানমন্ত্রী এবং পদাধিকার বলে চ্যান্সেলার শেখ হাসিনা বুয়েটের বিরাজমান পরিস্থিতিতে 'নীরব ও নিশ্চুপ' থাকার যে নীতি গ্রহণ করেছেন, তা সঠিক এবং সময়োপযোগী হয়েছে।

এদিকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা অব্যাহত থাকায় এবং ছাত্র ও অভিভাবকরা দারুণভাবে উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রেক্ষিতে শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ নিজেদের "বিপদ" সম্পর্কে আন্দাজ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে, পরিস্থিতি দ্রুত নাজুক হতে যাচ্ছে। Ball তখন তাঁদের Court-এ। যেভাবেই হোক না কেনো, এই Ball সরকারের Court-এ ঠেলে দিতে হবে। অতএব, একটা স্মারকলিপি প্রণয়ন করে চ্যান্সেলার শেখ হাসিনার হাতে দিতে পারলেই দায়িত্ব কিছুটা লাঘব হবে। অন্ততঃ একথাটা বলা যাবে যে, পুরো বিষয়টা এখন চ্যান্সেলারের কাছে, দেখা যাক, উনি কি পদক্ষেপ নেন। পর্যবেক্ষক মহলের মতে এসবই হচ্ছে বাইরের থেকে পাঠানো রাজনৈতিক উপদেশ। এজন্যই যে শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ ইতিপূর্বে চ্যান্সেলার শেখ হাসিনার 'সমঝোতার' পরামর্শকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, তাঁরাই এখন চ্যান্সেলার ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে স্মারকলিপি মারফত আহ্বান জানাচ্ছেন। আর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য শুরু হয়েছে জোর তদ্বির। ফল হলো না।

সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সেদিনের তারিখটা ছিলো ২৬শে মে মঙ্গলবার। দুপুর নাগাদ রমনার পথচারীরা অবাক বিস্ময়ে দেখতে পেলো যে, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির শ'খানেক সদস্যের একটা দল- কেউ খালি মাথায়, আবার কেউবা ছাতা মাথায় আব্দুল গণি রোড ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন সচিবালয়ের দিকে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্মারকলিপি প্রদান করা। কিন্তু বিধি বাম! প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অনির্ধারিত সাক্ষাৎ হলো না। প্রধানমন্ত্রীর পিএস-১ স্মারকলিপি গ্রহণ করলেন। অতঃপর শিক্ষক সমিতির সদস্যরা ক্যাম্পাসে ফিরে গেলেন।

এখন উদ্ধার পাওয়ার রাস্তা কোথায়? লং মার্চের আন্দোলন যেমন বিএনপি'র গলায় কাঁটার মতো আটকে রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে বুয়েটে আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী নিয়েও শিক্ষক সমিতি দারুণ বিপাকে পড়েছে। একদিকে "মান-সম্মান" বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় যেমন শিক্ষক ধর্মঘট প্রত্যাহার করা সম্ভব হচ্ছে না এবং অন্যদিকে তেমনিভাবে উপাচার্যের শূন্যপদে নিয়োগ লাভের জন্য জনাকয়েক সিনিয়র অধ্যাপক গোপনে 'লবি' শুরু করায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে বেশ নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিধি মোতাবেক উপাচার্য নিয়োগের এক্তেয়ার হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর। ঠিক এমনি এক সময়ে বুয়েটের সঙ্কট নিরসনের লক্ষ্যে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ (আইইবি) উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন, ইন্সটিটিউটের সহ-সভাপতি জনাব সেরাজুল মজিদ মামুন। এঁর আরও একটি পরিচয় রয়েছে। ইনি হচ্ছেন বিএনপি-সমর্থিত প্রকৌশলীদের প্রতিষ্ঠানে 'এ্যাব'-র সাধারণ সম্পাদক। সভাপতি হচ্ছেন জনাব এলকে সিদ্দিকী। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ইন্সটিটিউটের পক্ষে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের পিছনে কারণ রয়েছে। বর্তমানে ইন্সটিটিউটের কর্মকর্তার একাংশ এবং শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ হচ্ছেন সমগোত্রিয়। অর্থাৎ রক্তের সবগুলো কোষের একই স্থানে উৎস। মহলবিশেষের মতে পর্দার পিছনে রয়েছে "নব্য বিএনপি গোষ্ঠী"। এঁরাই হচ্ছেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির চালিকাশক্তি। এতএব, শিক্ষক সমিতির এ ধরনের বিপদের সময় উদ্ধারকল্পে ইন্সটিটিউটকে দিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করাতেই হচ্ছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে (৮-৯ই মে ১৯৯৮) কর্মকর্তাদের ভূমিকায় ক্ষমতাসীন দলের নীতি-নির্ধারকরা বেশ কিছুটা মনক্ষুণ্ণ হয়েছেন। এতদপো লক্ষে প্রকাশিত এক 'স্যুভেনীর'-এ প্রথম পাতার বদলে ১৫নং পাতায় দায়সারাভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি ছাপা হয়েছে। উপরন্তু 'সূচনা অনুষ্ঠান সূচী'তে প্রধান অতিথি হিসেবে আগমন এবং প্রধান অতিথির ভাষণদানের জায়গায় 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'—এই নামটুকু পর্যন্ত ছাপা হয়নি। অথচ দ্বিতীয় দিনের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় সংসদের মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার নাম ঠিকই ছাপা হয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি এবং ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক ও প্রকৌশলীদের একাংশ দারুণভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন।

প্রকাশ এ ধরনের এক প্রেক্ষাপটে বুয়েটের শিক্ষক সমিতিকে উদ্ধারকল্পে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটের বর্তমান নেতৃবৃন্দ যে 'ফর্মুলা'র প্রস্তাব করেছেন, তার সঙ্গে সমিতির সভাপতি ডঃ আব্দুর রাজ্জাক আকন্দ দ্বিমত পোষণ করেছেন। ডঃ আকন্দের কথা হচ্ছে স্মারকলিপির বাইরে কোনো 'ফর্মূলা'য় রাজী হওয়া সম্ভব নয়। অথচ শিক্ষক সমিতির কট্টর সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও ইন্সটিটিউটের বর্তমান নেতৃবৃন্দের মত হচ্ছে, অবস্থা যে পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে তা'তে ৭১+১ একুনে ৭২টি পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত "অগ্রসর" হওয়া সম্ভব নয়। আপাততঃ "আংশিক পরাজয়" মেনে নিতেই হবে। উভয় পক্ষের মত-বিনিময় অব্যাহত রয়েছে। পর্যবেক্ষক মহলের মতে, বুয়েটের বিরাজমান পরিস্থিতিতে চ্যান্সেলার ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার "নীরবতা"ই শিক্ষক আন্দোলনের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। অবশ্য এটাই হচ্ছে শেখ হাসিনার জন্য সঠিক পদক্ষেপ। কেননা পরিস্থিতির পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একমাত্র উপাচার্যের পদত্যাগপত্র গ্রহণ এবং নতুন উপাচার্য নিয়োগ ছাড়া চ্যান্সেলার হিসেবে তিনি বুয়েটের সঙ্কট নিরসনে যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, তা' শিক্ষক সমিতির মনঃপুত না হলেই, "বুয়েটের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ" হিসেবে সেইসব পদক্ষেপকে চিহ্নিত করা হবে।

অতএব মোদ্দা কথাটা হচ্ছে,- যেহেতু প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত এবং যেহেতু শিক্ষক সমিতি এবং সিনেট এই সমস্যা সৃষ্টি করেছে; সেইহেতু শিক্ষক সমিতি এবং সিনেটকেই বিরাজমান সমস্যার সমাধান করতে হবে।

আবারও রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের বক্তব্যের উল্লেখ করতে হচ্ছে। ছাত্রদের পাশাপাশি সম্প্রতি শিক্ষকরাও রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন বলে তিনি যে কথাগুলো উচ্চারণ করেছেন, বুয়েটের শিক্ষকদের কর্মকাণ্ডে তা' সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এঁরা নিজেদের সৃষ্ট ফাঁদে নিজেরাই বন্দী হয়েছেন। বুয়েটের সঙ্কট নিরসনে শিক্ষক সমিতি এবং সিনেটকেই এর উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। একটাই মাত্র পথ রয়েছে এবং তা' হচ্ছে নিজেদের মধ্যে "সমঝোতা"। তার ফর্মূলা হচ্ছে নিম্নরূপ :- ক) স্থাপত্য শাখার ১৩ জন অধ্যাপকের যৌথ পদত্যাগপত্র বিধিসম্মত নয় বলে সিনেট কর্তৃক বাতিল করতে হবে।

খ) ৭১ জন অধ্যাপক কর্তৃক প্রশাসনিক পদ থেকে দাখিলকৃত পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে হবে।

গ) ইকবাল মাহমুদ কর্তৃক চ্যান্সেলারের কাছে প্রেরিত পদত্যাগপত্র লিখিতভাবে প্রত্যাহার করতে হবে। এবং

ঘ) স্থাপত্য শাখার সঙ্গে ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়টা সমঝোতার মাধ্যমে সুরাহা করতে হবে।

অন্যথায় বুয়েটের বিরাজমান সঙ্কট ঝুলন্ত অবস্থায় রয়ে যাবে এবং এর সমস্ত দায়-দায়িত্ব বুয়েটের সিনেট এবং শিক্ষক সমিতিকেই বহন করতে হবে। লাগাতার শিক্ষক ধর্মঘটের মোকাবেলায় ছাত্র এবং অভিভাবকরা ধৈর্যের চরম সীমায় এসেছে। একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, 'রাজনীতি' বিষয়টা দূর থেকে খুবই সহজ মনে হয়। কিন্তু 'রাজনীতি' হচ্ছে 'শাঁখের করাতের মতো।' এই করাত আসতেও কাটে, যেতেও কাটে।